নারী অধিকার : দাবী ও বাস্তবতা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আলী আলীওয়াহ

ভাষান্তর : আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2011-1432

IslamHouse.com

﴿ حقوق المرأة بين الحقيقة والادعاء ﴾

« باللغة البنغالية »

علي عليوة

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: الدكتور محمد منظور إلهي

2011-1432

IslamHouse.com

নারী অধিকার : দাবী ও বাস্তবতা

গতকালই তো বলা হয়েছে : (তোমার নামে কত না অপরাধ সংঘটিত হয়েছে হে স্বাধীনতা।!) আর তা ব্যাপক রক্তপাত ও অশ্রুপাতের পর, যা ফরাসী বিপ্লবীরা গির্জা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে জায়েজ করেছিল। যার মধ্য দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বিশ্ব তখন প্রত্যক্ষ করেছিল বিপ্লবীদের শ্লোগান (স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব) আর বাস্তবতার ভূমিতে তাদের আচরণের মধ্যে কত ফারাক। তারা এসব পরিচালনা করেছিল তাদের প্রতিপক্ষের ওপর।

আজ একই বাক্য পুনরায় খাটানো যায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রে। আর নির্দ্বিধায় বলা যায় : (হায় তথাকথিত মানবাধিকার! কত অপরাধই না হালাল করা হলো তোমার নামে!) এই চটকদার শ্লোগানের আড়ালে পাশ্চাত্য জগত একটি সুপরিকল্পিত চৈন্তিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। পরম যত্নে যার পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে সামাজিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস এবং বিশ্বায়ন ও গ্লোবাল ভিলেজের (সারা বিশ্ব এক গ্রাম) নামে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরুদ্ধ সংস্কৃতি নির্মূলের লক্ষ্যে। বিষাক্ত পশ্চিমা মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতেই নারী অধিকার, শিশু অধিকার ও নানা নামে এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানো হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষ পশ্চিমা নারী সংগঠনগুলো বিশ্বের ওপর তাদের বৈধ পরিকল্পনাগুলো চাপিয়ে দেবার লক্ষ্যে জাতিসংঘের আড়াল গ্রহণ করেছিলো এবং এর পাশ্চাতে নারী অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের গুরুত্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলো। নারী সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে। দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে, তৃতীয় সম্মেলন ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে এবং চতুর্থ সম্মেলন ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আরও কিছু সম্মেলন হয় যেসব পরোক্ষভাবে ছিল নারী অধিকার সংক্রান্ত। যেমন ১৯৯৪ সালে কায়রোয় অনুষ্ঠেয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন।

পশ্চিমা সংগঠনগুলো জাতিসংঘের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকসহ জীবনের নানা পর্যায়ে পশ্চিমা মূল্যবোধের পরিকল্পনায় বাধ্য করার চেষ্টা চালিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বের করার প্রয়াস পেয়েছে। যাতে নারীর অধিকারগুলো সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে জাতিগুলোর স্বকীয় চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের যে দেয়াল বা অন্তরায় রয়েছে তা নির্মূল করা যায়। এসব চেষ্টারই সারসংক্ষেপ সিড্ও তথা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।

সিডও এসে নারী অধিকারকে মানবাধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। যা তাকে নারী অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণায় রূপ দেয়। এ চুক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিকসহ সব অঙ্গনে নারী-পুরুষের অধিকারে পূর্ণ সমতার দাবী জানায়। এতে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য চুক্তিকে আইনীভাবে বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব রাষ্ট্রের নারীর প্রতি বৈষম্যকে সমর্থনকারী সকল প্রকার স্থানীয় আইন ও

বিধান বাতিলের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। এবং সিডও কমিটি নামে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা হয়, যারা প্রতি কয়েক মাস অন্তর স্বাক্ষরকারী দেশে এর কতটুকু বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখবে। যদিও চুক্তির ধারায় এমন বক্তব্য ছিল যে একটি সিডও কমিটি গঠন করা হবে যার লক্ষ্য হবে প্রতিটি দেশের চেতনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমতাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এমন প্রতিনিধিত্ব নেই। বরং সদস্য রাষ্ট্রের অধিকাংশই ছিল পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী, যাদের চেষ্টাই হলো নারী অধিকার সংক্রান্ত নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও অভিরুচি বিশ্বের অবশিষ্ট জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া।

বিরোধের অবশ্যম্ভাবিতা :

সিডও সনদ এমন কিছু মৌলিক চিন্তা-চেতনা ও অভিরুচি নির্ভর যা তার আদর্শিক ভিত গঠন করে দেয়। এসব চেতনার প্রথমটি হলো নারীকে পরিবারে অবদান রাখা স্বতন্ত্র সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করা, যৌথসৃষ্টি হিসেবে নয়। আর নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা হবে সব দিক থেকে। অন্যকথায় এ দুই জাতির মধ্যে সব দিক থেকে সাদৃশ্য ও অভিন্নতা থাকবে। এদের একেকে অন্য থেকে পৃথককারী যে কোনো ফিজিক্যাল বা বায়োলোজিক্যাল পার্থক্য থেকে বিরত থাকতে হবে। আর ওই সমতার পূর্ণতা এবং দায়িত্ব ও অধিকারে নারী ও পুরুষের মাঝে পূর্ণ সাযুজ্য ও স্বাতন্ত্র্যের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে কড়াকড়ি পিতৃত্ব ও পৌরুষের সম্বোধনের প্রতিনিধিত্বকারী পুরুষের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক

সংঘাত অনিবার্য করে তোলে। নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘাত বলতে বুঝায় নারীকে তার বিশ্বাস, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলী দিতে বাধ্য করা এবং প্রতিটি পরিবারে বিশৃঙ্খলার আগুন লাগিয়ে দেয়া। যা ওই ভিতের গাঁথুনিকে ছত্রখান করে দেয় যা সমাজ ও এর অস্তিত্ব সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রস্তরের ভূমিকা রাখে।

চুক্তিতে এমন তিনটি ধারা রয়েছে যেগুলো পশ্চিমা দর্শন মেনে নিতে বাধ্য করে। সেগুলো হলো ধারা নং ১, ২ ও ১৬। যেমন ধারা নং ২ তে প্রতিটি দেশের জাতীয় সংবিধান ও তার অন্য আইনসমূহে নারী-পুরুষের সমতা বিধান প্রবর্তনের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। তেমনি নারীর প্রতি বৈষম্যের ভিত্তিতে দাঁড়ানো যে কোনো আইন, বিধান, নিয়ম ও আচার বাতিল অথবা পরবির্তনের জন্য আইন পাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাও রয়েছে।

এসব ধারার মধ্যে সবচে ক্ষতিকর ১৬ নং ধারা। এতে বিয়ে ও পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরসনে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বিশেষত নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে একই অধিকার, স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই অধিকার, দাম্পত্য জীবনে এবং দাম্পত্য জীবন বাতিল করণে একই অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। একই কথা বলা হয়েছে পরিবারের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং শিশুদের অভিভাকত্ব ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে!

নারী ও পুরুষকে বিবাহ বন্ধন, দাম্পত্য জীবন ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অভিন্ন অধিকার প্রদানকারী এই ধারা বিবাহ বন্ধন ও মোহরানার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অভিভাবক, পরিবারের ভেতরে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব, একাধিক বিয়ে, মুসলিম রমণীর অমুসলিম পুরুষকে বিয়ের নিষিদ্ধতা, তালাক, তালাক ও মৃত্যুর ইদ্দত এবং সন্তান প্রতিপালনে ইসলামের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আশ্চর্যের বিষয় হলো, চুক্তিটি এতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে এ ধারার যথাযথ প্রয়োগে বিশেষভাবে সতর্ক করেছে! অথচ তা জাতিসংঘের নারীর প্রতি বৈষম্য সংক্রান্ত ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, তাতে রাষ্ট্রগুলোকে চুক্তির কিছু ধারায় একমত না হতে পারলে সেসব ধারা না মানার অধিকারও প্রদান করা হয়েছে। এদিকে তা রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইন ও বিচারের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল। কেননা তা রাষ্ট্রকে তার সংবিধান ও আইনকে সবিস্তারে সিডও সমর্থিত ও স্বীকৃত দর্শনের সঙ্গে একমত হতে বাধ্য করে। এমনকি তা সে জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, মূল্যবোধ ও চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও। আর তা এ হিসেবে ধর্ম বা জাতীয় সংস্কৃতি নয়; প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানের সিডও'ই হবে আইনি ভিত্তি।

শক্তি প্রয়োগের হুমকি :

যে কোনো রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদ্ধৃতি অনুযায়ী তার সংবিধান বা স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় নারীর প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যকে স্থান দেবে, এই ধারাটি ভবিষ্যতে জাতিসংঘের জন্য তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা শাস্তি আরোপের মত পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বার উন্মোচন করবে। এখানে

আন্তর্জাতিক উদ্ধৃতি বলতে বুঝানো হচ্ছে সিডও সনদকে। সিডও সনদের দাবী, জাতিসংঘ যে কোনো রাষ্ট্রে স্থানীয় বিচার বিভাগের ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখবে এবং স্থানীয় আইনকে স্থগিত বা রহিত করতে পারবে। সামগ্রিকভাবে সনদটি কথিত এমন সব ভুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সে নিজেই যাতে পা ফেলতে যাচ্ছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে শর্তহীন সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে গিয়ে এতে বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে এ দুই সত্তার মৌলিক পার্থক্যকে। যা একে অপর থেকে এদের আলাদা করে। নারীর প্রতি বৈষম্য নির্মূল করতে গিয়ে এতে পুরুষের ওপর বৈষম্য করতে কোনো বাধা নেই। যারা এ কনভেনশনের ধারা প্রস্তুত করেছেন তারা এ বাস্তবতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে দুটি ভিন্ন সামাজিক কর্তব্য ও বৈশিষ্ট্যধারী শ্রেণীর মধ্যে সমতা বিধান করাই বরং তাদের ওপর জুলুম। জুলুম কাম্য হতে পারে না। কাম্য তো উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ ও নায্যতা।

এখানেই আসে জেন্ডার (সামাজিক লিঙ্গেভেদ) -এর প্রসঙ্গ, যাতে সকল আকীদা ও আখলাকগত নিদর্শন ধ্বংসের জন্য প্রধান পয়েন্টের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। যা নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় গর্ব বোধ করে। সিডও সনদে এ চিন্তাটি ‘কোণের পাথর’ -এর রূপ পরিগ্রহ করে। তাই দেখা যায় অনুচ্ছেদ (৫) এ বলা হয়েছে : নারী ও পুরুষ- প্রত্যেকের ভূমিকার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধরন পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, নারীর জন্য মাতৃত্ব কোনো বায়োলজিক্যাল বা ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট নয়। বরং এ ধারা মতে তা সামাজিক দায়িত্ব, যে কোনো ব্যক্তিই পারে দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নিতে। এমনকি যদিও এ ব্যক্তি হয় পুরুষ!! এ

বক্তব্যটি পুরুষ থেকে নারী কিংবা নারী থেকে পুরুষ হওয়ার জন্য প্রত্যেককে লিঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ এনে দেয়। একে মানবাধিকারের একটি অংশ গণ্য করেই এমন করা হতে পারে। সনদটি এর দরজাও খুলে দেয় যাকে সনদে পরিবারের নতুন প্রকার বলে নামকরণ করা হয়েছে। এটি গঠিত হতে পারে পুরুষ ও পুরুষ কিংবা নারী ও নারীর সমন্বয়ে। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভকাল থেকে প্রচলিত বিয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বন্ধনে গঠিত পরিবার ব্যবস্থাকে যা প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, যে বিয়ের উদ্দেশ্য সন্তান জন্মদান এবং মানব বংশধারা অব্যাহত রাখা।

সনদের (১০) নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে : শিক্ষা হবে যুবক ও যুবতীদের সমন্বিত ব্যবস্থায়। এতে শিক্ষার সকল পর্যায়ে বয় শিফট ও গার্লস শিফট বা বয়েজ স্কুল/কলেজ বা গার্লস স্কুল/কলেজের নিয়ম যেখানেই আছে তা নির্মূল করতে হবে। সহশিক্ষা নিশ্চিত করতে পাঠ্য কারিকুলামেও পরিবর্তন আনতে হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ধারাটি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিরাট হুমকি সৃষ্ট করে বৈ কি। তাদেরকে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কোনো মানসিক, শারীরিক বা বায়োলোজিক্যাল সব ধরনের পার্থক্য ও বাধা নির্মূলের থিউরিতেই গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে আমাদের সামনে এমন এক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে যাদের পুরুষরা হবে নারীদের সাদৃশ্যধারী এবং নারীর ভূমিকা পালনকারী আর নারীরা হবে পুরুষদের সঙ্গে সাদৃশ্যধারী এবং তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব চর্চাকারী।

আর (১২) নং অনুচ্ছেদটি নারী ও পুরুষের মাঝে পারিবারিক অধিকারগুলোয় সমতা দাবী করে। এর মধ্যে রয়েছে মীরাছের কথা যা ইসলামী শরীয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যে শরীয়ায় উত্তরাধিকার বণ্টন ব্যবস্থাকে ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নারীকে তার নিজের ও পরিবারের সব ধরনের আর্থিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। আর এ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বিবাহিত জীবনে তার স্বামীর ওপর এবং প্রাক বিবাহ জীবনে আত্মীয়-স্বজনদের কাঁধের ওপর।

অতপর পরবর্তীতে আর কী হবে? মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা ও এতে সহযোগিতার ছদ্মাবরণে বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্নটি এখন সামনে আসে তা হলো, এরপর আর কী হবে? এর জবাবে রাষ্ট্রগুলো ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কার্যকর নড়াচড়া ও তৎপরতা কামনা করে। যাতে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় পরিচালিত আন্তর্জাতিক চক্রান্তগুলোর কার্যকর মোকাবেলা করতে পারে। আর আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সনদে যাতে নৈরাজ্যমূলক মূল্যবোধ প্রবর্তন করতে স্থায়ী ধারা সংযোজন বরদাশত না করে।

তদুপরি আগামী পর্বগুলোতে ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনগুলোকে, যাদের অগ্রভাগে থাকবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি), আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রচার ও ত্রাণ সংস্থা, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থার অধীন আন্তর্জাতিক ইসলামী নারী ও

শিশু কমিটি। এদের প্রধান দায়িত্ব হবে ইসলামী ও সাধারণ উভয় জ্ঞানে পারদর্শী কিছু ব্যক্তিত্ব তৈরি করা, যারা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং স্বেচ্ছাচারী ধারাগুলো অব্যাহত রাখার যে কোনো প্রচেষ্টা রুখবার চেষ্টা করতে এসব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। যেমন আন্তর্জাতিক ইসলামী নারী ও শিশু কমিটি জাতিসংঘের নারী সংক্রান্ত সম্মেলনগুলোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারা মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধি এবং খ্রিস্টান নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে নারী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণার বেশ কিছু নৈরাজ্যবাদী ধারা বাতিলে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য তারা ধন্যবাদ পেতেই পারে। আশা করা হচ্ছে নারী ও শিশু সংক্রান্ত আগামী শীর্ষ বৈঠকগুলোতে নৈরাজ্যবাদী পশ্চিমা সংগঠনগুলোর পরিকল্পনা নস্যাতে এ কমিটি এবং সমমনা সংগঠনগুলো তাদের সক্রিয় ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখবে।

অব্যাহত পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলার দাবী হলো, আরব তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো মানবতার বিশেষত মুসলিমদের সমকালীন অগ্রযাত্রায় পশ্চিমা মূল্যবোধের হুমকি সম্পর্কে দর্শকদের সচেতন করা। এবং তাদেরকে নারী ও শিশু অধিকারের আড়ালে পশ্চিমা নারী সংগঠনগুলোর বিশ্ব সম্প্রদায়ের ওপর তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার কূটকৌশল সম্পর্কে বিভ্রান্ত জনগণকে সজাগ করা।

পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলার আরেকটি দাবী হলো, পাশ্চাত্যে নারীদের প্রকৃত দুর্দশার করুণ চিত্র মানুষের সামনে উন্মোচন

করে দেয়া। বর্তমানে নারীরা যেখানে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনগুলোর সস্তা পণ্যে পরিণত হয়েছে। নারীদের দেহকে পুঁজি বানিয়ে বড় বড় কোম্পানিগুলো বিশাল মুনাফা লুটে নিচ্ছে। যেখানে প্রতিনিয়তই নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। অথচ তারাই আবার নারী অধিকার নিয়ে বড় বড় কথা বলে। মুসলিম দেশগুলোকে তারা নারী অধিকারের কত না সবক দেয়। মুসলিম জাতি আপন চেতনা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবে এমন কোনো উপলক্ষ্যই তারা সমলোচনা থেকে বাদ রাখে নি। এখন সময় এসেছে খোদ পাশ্চাত্যেই নারী নির্যাতন ও তাদের ওপর সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ তোলার। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।